

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময়, মহান দয়ালু

ভীতুর ডিম



আমাকে সবাই ভীতুর ডিম ডাকলেও আমি যে একটা সাহসের ডিম, এইটা জানে শুধু ডিগবাজি। কেউ যদি খুব ভীতু হয়, তাকে সবাই ভীতুর ডিম ডাকে, এইটাই নিয়ম। আচ্ছা, ভীতু কি কোনো পাখি, যে তার ডিম হবে? বড়দের অনেক কথাবার্তাই খুব বোকা বোকা, যদিও বড়রা তা বোঝেন না।

সেইদিন আন্মু আমাকে বললেন,

‘এই নাভান, যা তো, রান্নাঘরের বাতিটা নিভিয়ে আয়।’

আন্মু জানেন, আমি অন্ধকার ভয় পাই, তা-ও যে কেন রান্নাঘরের বাতি নিভাতে আমাকেই বলেন, জানি না। আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম ডিগবাজিকে কোথাও দেখা যায় কি না। আন্মুকে তো আর বলা যাবে না, রান্নাঘরের বাতি নিভিয়ে দেওয়ার পর কীরকম অন্ধকার হয়ে যায়, আমি ওখান থেকে একা একা ফিরব কীভাবে? ডিগবাজিটা কোথাও এক মিনিট স্থির হয়ে বসতে পারে না, কই চলে গেছে কে জানে।

আমাকে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখেই আন্মু কীভাবে যে বুঝে গেলেন—আমি আসলে ভয়ে একা একা রান্নাঘরে যেতে পারছি না, আর ডিগবাজিকে খুঁজছি। আমি এই ব্যাপারটা আগেও দেখেছি, আন্মুরা কেমন করে যেন সবই বুঝে যান। আন্মু গলার স্বরটাকে আমাদের ম্যাথ টিচার শামারুখ মিসের মতো করে বললেন,

ভীতুর ডিম

‘কিরে ভীতুর ডিম, একা একা যেতে ভয় পাচ্ছি?’

-হুম

এরই মধ্যে কোথা থেকে ডিগবাজি এসে হাজির। ডিগবাজির সামনেই আন্মু বলে বসলেন,

-কয়েকদিন পর যখন বিয়ে করবি, তখন যদি তোর বউ এসে দেখে তুই এরকম ভয় পাস, মান-ইজ্জত থাকবে?

আন্মুটা যে কী! কিছু হলেই শুধু বলবে, কয়েকদিন পর বিয়ে করবি। খুব, আমার বয়স এই সেপ্টেম্বরে মাত্র তেরো হলো। কিছুদিন পরে বিয়ে করব আবার কী জাতীয় কথা?

আন্মু যখন আববুকে বাজার থেকে একসাথে পাঁচ কেজি ছোট মাছ কিনে আনার জন্য কিংবা অফিস থেকে দেরিতে ফেরায় রুণু খালার বাসার দাওয়াতে যেতে না পারার জন্য ইচ্ছেমতো বকেন, তখন আববু দুঃখী দুঃখী মুখ করে আমাকে বলেন,

‘বুঝি নাভান, জীবনটা কঠিন, বড়ই কঠিন। তোরও দিন আসবে।’

আমার কী জন্য যেন সেই সময়ে ফুলি খালার বড় বড় চাদর ধোয়ার দৃশ্য মনে হয়, আর একটু হাসিও পায়। কিন্তু এমন সময় হাসাহাসি করাটা ঠিক হবে না, এ জন্য হাসি না। আমি বোধ হয় আসলে একটু খারাপও আছি, নয়তো নিজের আববুর দুঃখের সময় আমার হাসি কী জন্য পাবে?

যাই হোক, আববুর এমন দশা দেখে আমি তো মনে মনে ঠিক করেছি, সহজে বিশেষাধিই করব না। কী দরকার? পরে আমার বিয়ের পর যদি আমার মতোই একটা ফাজিল ছেলে হয়, তাহলে সেও আমার বউ আমাকে ধোলাই দিলে মনে মনে হাসবে। আর আমার থেকে অল্প একটু বেশি বদ হলে তো জোরেও হেসে ফেলতে পারে। কী ভয়ানক ব্যাপার! ডিগবাজিও কম বদ না। আন্মুর কথা শুনে একদম দাঁত বের করে হাসছে।

-আম্মা, নাব্বান ভাইয়েরে বিয়া দিলে বিরাট কাণ্ড হইব। মাইয়া
মানুষ তেইল্লাচুরা ডরায়। নাব্বান ভাইয়েও তেইল্লাচুরা ডরায়।
তহন তেইল্লাচুরা আইলে মারব কেডা?

-আরেহ তা-ই তো। নাভান তো তেলাপোকাও ভয় পায়। না রে
নাভান?

আম্মু আর ডিগবাজি মিলে এমন করে হাসছে, আমার মনে হচ্ছে,
জঙ্গলে চলে যাই। আমাদের ইসলামিক স্টাডিজ-টিচার ক্লাসে সবাই মিলে
বেশি কথা বললেই, হেঁটে হেঁটে ক্লাসের মাঝখানে এসে বলেন, ‘তোদের
জালায় আমি একদিন জঙ্গলে চলে যাব।’ স্যারের মতো এই মুহূর্তে
আমারও জঙ্গলে চলে যেতে মন চাচ্ছে। সেখানে তো আর কেউ আমাকে
ভীতুর ডিম বলতে পারবে না, আবার ফিসফিস করে হাসতেও পারবে
না। আমাকে কেউ বলুক—কোথায় লেখা আছে, তেলাপোকা দেখলে
শুধু মেয়েরাই ভয় পাবে, ছেলেরা ভয় পেতে পারবে না। আর আমি তো
হেঁটে যাওয়া তেলাপোকাকে তেমন একটা ভয় পাই না, তবে হেঁটে যাওয়া
তেলাপোকাকে আমার ঘেন্না লাগে খুব। এ জন্য লিচুর বিচি দেখলেও
আমার কীরকম জানি লাগে, তখন তেলাপোকার কথা মনে হয়। আমি
আসলে ভয় পাই উড়তে থাকা তেলাপোকাকে। আর এই জিনিস কোনো
এক বিচিত্র কারণে আমি যেখানেই থাকি, লাফ দিয়ে এসে আমার মাথায়
কিংবা ঘাড়ের মধ্যে বসবে। ডিগবাজিটাকে আমি কাল আমার নতুন আঁকা
ছবি দেখাব না। ওর সাথে কোনো কথাই বলব না।

আমার তিন বছরের ছোট বোন ফিরাশাতও কিছু না বুঝে তাদের সাথে
হেসে হেসে বলতে লাগল ‘তেইল্লাচুরা, তেইল্লাচুরা’। বাচ্চাদের এই একটা
আজব ব্যাপার, এরা কীভাবে জানি পচা কথাগুলোই আগে আগে শিখে
ফেলে।

আমি হেঁটে হেঁটে আমার রুমের দিকে চলে এলাম। ডিগবাজিও আমার

ভীতুর ডিম

পিছু পিছু এসেছে। আমি একটু ভেংচির মতো কাটলাম। আমাদের ক্লাসের আরাশ ভেংচি কাটার ওস্তাদ। ওর মতো ত্যাড়াব্যাকা মুখ তো আমি জীবনেও বানাতে পারব না।

-নাব্বান ভাই, রাগ হইছেন?

আমি অন্যদিকে মুখ করে তাকিয়ে আছি। একে একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আজও ডিগবাজিকে আমি একটি লাটিম এনে দিয়েছি। আম্মাপাড়া মুখস্থ করায় নাসির ওস্তাদ আমাকে একশ টাকার নতুন একটি নোট উপহার দিয়েছেন গত সপ্তাহে। তখন থেকেই ডিগবাজি বায়না ধরেছে তার লাটিম চাই, এত চকচকে নতুন নোটটা খরচ করতে আমার আসলেই খুবই কষ্ট হচ্ছিল, তবু আমি ওকে লাটিম কিনে দিয়েছি। সে জন্যই তো দাদাভাই বলেন, ‘দুনিয়াতে ভালো মানুষের দাম নাই রে পাগলা।’ আমি খুবই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, তা-ও দাদাভাই আমাকে পাগলা বলে। তবু তো ভালো, ভীতুর ডিম বলে না। দাদাভাইয়ের মুখে পাগলা শুনতে আমার অবশ্য ভালোই লাগে।

-ও ভাই, অত্যাধিক রাগ ভালো না। আমার নানায় মিরিতুর আগে কইয়া মরছে।

-চুপ থাক।

-ও নাব্বান ভাই! আমি জবাব দিলাম না। হোমওয়ার্ক শেষ করতে হবে। অনেকগুলো ম্যাথ করা লাগবে, ম্যাথ জিনিসটা এত বাজে যে, বলার মতো না।

-নাব্বান ভাই, শনপাপড়ি খাইবেন?

যদিও শনপাপড়ি আমার খুব প্রিয়, কিন্তু তা-ও আমি ডিগবাজির সাথে কথা বলব না।

-নাব্বান ভাই, একটা কৌটায় টিকটিকির ডিম ভরতাই। দেখবেন?

ডিগবাজি প্রায়ই নানান উদ্ভট উদ্ভট কাজ করে। টিকটিকির ডিম জমাচ্ছে কী জন্য, কে বলবে। আন্মু বলেন, ডিগবাজির বয়স নয়-টয় হবে, কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয়, সে একটা অনেক বড় মানুষ।

এক বছর আগে আমি আর আন্মু পাড়ার দোকানটায় গিয়েছিলাম কী জানি একটা কিনতে। তখন দেখি, দোকানের পাশেই বেঞ্চিতে একটি ছেলে বসা। পত্রিকার কাগজে করে শনপাপড়ি খাচ্ছে। ছেলেটা অত্যন্ত ময়লা বাদামি রঙের একটি প্যান্ট পরে থাকলেও, তার গায়ের হলুদ রঙের গেঞ্জিটা একেবারে চকচকে নতুন। ছেলেটার চোখের পাপড়িগুলো এত বড় বড় যে, সেগুলো উলটে গিয়ে ভ্রতে লেগে যায়।

সেই অদ্ভুত ছেলেটির শনপাপড়ি খাওয়া দেখে আমার মনে হতে লাগল, এর চেয়ে মজার কিছু আর হতেই পারে না। আমি বোধ হয় তখন একটা ছুঁচো হুঁদুরের মতো ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ছেলেটা হঠাৎ করেই হাতের কাগজ থেকে একটু শনপাপড়ি খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল আর বলল, ‘খাইবেন?’

আমাকে সাধারণত কেউ আপনি করে বলে না, তাই ছেলেটার মুখে আপনি শুনে আমার নিজেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মনে হতে লাগল। আমি আন্মুর দিকে তাকালাম।

আন্মু তাড়াতাড়ি করে বললেন, ‘না না, তুমি খাও বাবা। আমি ওকে কিনে দেবো।’

ছেলেটা কেমন দুঃখীর মতো চেহারা নিয়ে হাতটা নামিয়ে ফেলল। আমার ওর জন্য কী যে মায়া লাগল। আহা! আন্মুরও মনে হয় আমার মতোই ওর জন্য মায়া লেগেছিল, তাই শেষ পর্যন্ত কী জানি চিন্তা করে বললেন,

ভীতুর ডিম

‘আচ্ছা নাভান, ওর থেকে একটু শনপাপড়ি নো’

ছেলেটা এত খুশি হলো যে, বলার মতো না; ওর হাতে থাকা শনপাপড়ির কাগজ পুরোটাই আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। আমি অল্প একটু ভেঙে নিলাম। এরপর আশু দোকানদারের কাছ থেকে আরও কী কী জানি কিনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

রাহাত, রাফসান আর রিদিতির আশুর মতো আমার আশু কখনো বলেন না,

‘এই যে বাচ্চারা, তোমরা ভুলেও বাইরের খাবার খেয়ো না। বাইরের খাবারে ভয়ংকর জার্ম থাকে। খেলেই ঠুস করে পেটের অসুখ হবে।’

সব সময় কিনে না দিলেও মাঝে মাঝে মা নিজেই রাস্তাঘাটের নানান খাবার খান আর কেমন লজ্জা টাইপ মুখ করে বলেন,

‘এই নাভান, খাবি?’

ফুচকা আশুর খুবই প্রিয় খাবার। একবার বাবা তার মোবাইল-ফোনে একটা ভিডিও চালু করে আমাকে আর মাকে তাড়াতাড়ি দেখতে বললেন। সেখানে একটা নোংরামতো রুমে কতগুলো লোক খালি গায়ে ফুচকা গোল করে কেটে কেটে রাখছে, আবার কয়েকটা মহিলাও আছে, ছোট একটা বাচ্চাও দেখা যাচ্ছে। একজন বুড়ো চাচাকে দেখা গেল কিছুক্ষণ আচ্ছামতো কান চুলকাতে, এরপর হাত না ধুয়েই কাজ করতে লাগল। ভিডিওটার মাঝামাঝি একটা জায়গায় ওই যে বাচ্চা একটা ছেলে ছিল, সে দাঁড়িয়ে ছোট কাজ করে দিলো আর সেটা গিয়ে পড়ল গোল গোল চ্যাপ্টা ফুচকাগুলোর ওপর। বাবা ভিডিও থামিয়ে বললেন,

‘দেখো দেখো, ভালোমতো দেখো, মা-ছেলে দুইজন মিলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো এই বস্ত্রহীন গলাধঃকরণ কর। খাও, আরও বেশি করে খাও।’

গলাধঃকরণ মানে যদিও আমি জানি না, তবে মনে হচ্ছে এর মানে খাওয়াই হবে। এই ভিডিও দেখার কিছুদিন পরেই আন্মু আর আমি যখন স্কুল থেকে ফিরছিলাম, তখন রাস্তার পাশের পরিচিত ফুচকার ভ্যান দেখে মা আমাকে নিয়ে নেমে পড়লেন। খানিকটা অপরাধীর মতো মুখ করে আমাকে বললেন,

‘এই ফুচকাগুলো কিন্তু ভালোই হবে, বুঝেছিস নাভান! চাচাকে দ্যাখ, কী সুন্দর দাড়ি আছে, পাঞ্জাবি পরে থাকে। উনি ভালো ফুচকাই বেচবে।’

আমার আন্মুটা কেমন বাচ্চাদের মতো। সবার আন্মুর চেয়ে ভালো আর আলাদা। মাঝে মাঝে এমনভাবে কথা বলেন, তখন আমার মনে হয় মায়ের বয়স আমার মতোই তেরো। আন্মু কোনো আনন্দের কিছু হলে এত বেশি লাফালাফি করেন যে, আমার লজ্জাই লাগে।

দোকান থেকে আন্মুর কেনাকাটা শেষ হলে বড় পাপড়িওয়ালা ছেলেটার মাথায় হাত রেখে বললেন,

-এই যে বাবু, তোমার নাম কী?-আমি বাবু না। আমার নাম জগলু। আমি আর আন্মু একসাথে হেসে ফেললাম। আমাদের হাসি দেখে ও একটু রেগেই গেল যেন। এরপর আন্মু বাড়ির দিকে হাঁটা দিলো আমাকে নিয়ে, ছেলেটাও কী চিন্তা করে আমাদের সাথে হাঁটতে লাগল।

-কই থাকো তুমি?-কাছেই থাকি, পরীবাগের রাস্তার ওপরে নীল পলইতিন দেওয়া বস্তিগুলো চিনেন, ওইহানে থাকি।-তোমার বাবা-মা নাই?

-সবাইই আছে। বাড়িত মায়ে আছে, চোখ কানা। এক চোখে দেহে না। একটা ভইন আছে বড়, হের সমান।

ছেলেটি আঙুল দিয়ে আমাকে দেখাল।

ভীতুর ডিম

-আর বাবা?

-আব্বায় মাসে দুই-একবার বাড়িত আছে। কিছু বাজার-বুজার কইরা দেয়। আমার জন্য খেলনাও আনে।

-তুমি পড়ালেখা করো নাই?

-পড়ালেখা করি না, ভাল্লাগে না। মাঝে মাঝে গাছের দোকানডির ওইখানে কতডি আফা আছে, এই বড় বোরোড নিয়া, ছক নিয়া। লেখা শিখায়। মজার মজার খাওন দেয়। এই জন্য যাই। আমি পড়ি না।

ওর কথা শুনে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। আন্মুও হাসছিল।

-তুমি কী কর?

-আমি লুসনি বেচি। আমার ভইন লুসনি সিলাইতে পারে, রানতে পারে, ওইডি বেচি।

বলেই সে হাতের পলিথিনের ব্যাগ থেকে কতগুলো হাড়ি-পাতিল ধরার কাপড় বের করে দেখাল।

ছেলেটির কথাবার্তাগুলো আমার এতই ভালো লেগে গেল যে, বলার মতো না। আন্মুও বোধ হয় আমার মতোই ওকে পছন্দ করে ফেললেন। এরই মধ্যে আমরা বাসার সামনে চলে এসেছি। আমাদের বাসাটা আসলে বাসার মতো না, বাড়ির মতো। ঢাকা-শহরের সবগুলো বাড়ি বিল্ডিংয়ের মতো হলেও আমাদের এই বাড়িটায় একটা ছোট উঠোন আছে, একতলা বাড়ি। বড় বড় তিনটা আমগাছ আছে। একটা অনেক বড় কড়ইগাছ আছে। অনেকগুলো সাদা ফুলের গাছ আছে। আবার অনেক সবজি গাছও আছে। দাদা যখন হেল্থে চাকরি করতেন, তখন এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন। এখন উনি গ্রামে চলে গিয়েছেন, মাঝে মাঝে এসে আমাদের সাথে থাকেন। উঠানের মাটি খোঁচাখুঁচি করেন।

গাছের মরা পাতা আর ডাল কেটে দেন। নতুন গাছের চারা লাগান। আর ফুলি খালাকে বকাবকি করেন গাছগুলোকে ভালোমতো দেখে-শুনে রাখতে পারেন না এই অপরাধে। আর আমার দাদি খুব মোটা তো এই জন্য ড্রয়িংরুমের সাথে লাগানো খোলা বারান্দাতে বসে দাদা ভাইয়ের কাণ্ডকারখানা দেখেন। প্রায়ই বলেন, এই মানুষটারে নিয়ে আর পারা গেল না। তখন আমার খুবই আনন্দ লাগে।

আমরা তিনজনই বাড়ির মেইন গেটের সামনে পৌঁছে গেছি তখন। আশু কী মনে করে যেন ছেলেটিকে বললেন,

‘এই জগলু, চলো আমাদের বাড়ি। পায়স খাওয়াব। খাবে?’

পায়সের কথা শুনেই জগলুর চোখটা চকচক করে উঠল। আশু গেটটা হাত দিয়ে সরাতেই আমাদের আগেই জগলু ভেতরে ঢুকে পড়ল। আর ছন্দে ছন্দে বলে উঠল,

‘জগলু পাগলু, আপনোগো বাড়িত ঢুকল।’

আমি মনে মনে ভাবলাম, কী পাগলা ছেলেরে বাবা।

উঠোন পেরিয়ে আমাদের ড্রয়িংরুমটাই আগে পড়ে। সেই পর্যন্ত যেতে যেতে জগলু নামের আধাপাগল ছেলেটা কয়েকটা ডিগবাজি দিয়ে কড়ইগাছের নিচে চলে গেল, এরপর আরও কয়েকটা ডিগবাজি দিয়ে বড় আমগাছটার কাছে গেল। এরপর চোখের পলকে বাড়ির সামনে চলে এলো।

‘আরেহ বাবা, তুমি তো দেখছি ডিগবাজি মাস্টার!’

আশু বললেন।

আমি অনেকবার ডিগবাজি শেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সব সময়ই কেন জানি কাত হয়ে ডান দিকে পড়ে যাই। জগলুর ডিগবাজি দেখে তাই আমার একটু হিংসাই হলো। সেই সময়ই আমার মাথায় কী জানি হলো, আমি ওর মতোই ওকে বললাম—

‘ডিগবাজি ডিগবাজি
খুব পাজি খুব পাজি
খায় খালি ডিমভাজি’

জগলু হাত তালি দিয়ে উঠল আর বলল,
‘আমি হইলাম ডিগবাজি
আমি হইলাম কুব পাজি
আমি খাই ডিম্বাজি।’

সেই থেকে ওর নাম ডিগবাজি হয়ে গেল। আর ও এমন বদের হাড্ডি যে,
কেউ ওকে নাম জিজ্ঞেস করলে ও নিজেও বলে, ‘আমার নাম ডিগবাজি’।
আম্নু ভেতরে গিয়ে বোরকা খুলে ঘরের কাপড় পরে ড্রয়িংরুমে এসে
বসলেন। ডিগবাজি তখন আমাদের মাছের একুরিয়ামটার সামনে দাঁড়িয়ে
অবাক হয়ে মাছ দেখছে।

-কী সুন্দর মাছ! এইডি এমুন কমলা রঙের কেন্নে হইছে?

আমি একটু মজা করার জন্য বললাম,

-কমলা রঙের হবে না তো কী হবে? এরা তিনবেলা কমলা খায়।

ডিগবাজিটা বদ হলে কী হবে, সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে ফেলল, এরা
আসলেও কমলা খায়। অবাক হয়ে বলল,

-কী আচানক বিষয়, মাছে আবার কমলা খায়। আগের বার শীতে
আব্বায় আমাগো জন্য কমলা আনছিল। জন্মের চুকা। চুকা খাইতে
মজা নাই।

এরপর নীল রঙের ফাইটার ফিশগুলো দেখে বলে উঠল,

-এই নীল রঙের মাছগুলান কী খায়? কী খাইয়া এইডি এরুম নীল
হইছে বাইয়া?

ওর প্রশ্ন শুনে আমি একটু বিপদেই পড়ে গেলাম। নীল রঙের কোনো ফল আছে বলেও মনে পড়ছে না।

আম্মু ফুলি খালাকে ডেকে পায়েস দিতে বললেন। এরপর ডিগবাজিকে বললেন,

-নাভান আসলে তোমার সাথে মজা করেছে। মাছ কমলা খায় না। এই মাছগুলো এরকমই দেখতে। আর ওরা ছোট ছোট দানার মতো একটা খাবার খায়। ওই যে দেখছ না ছোট বোতলটায় দানা দানা একটা জিনিস? এটাই ওদের খাবার।-এইডি তো দেকতে সইস্যার মতো! আমি ভাবি সইস্যা আবার কী বস্তু।

-আম্মু, সইস্যা কী?

- সইস্যা মানে হলো সরিষা, এক ধরনের সিড।

-ও আচ্ছা।

ডিগবাজি তাড়াতাড়ি বলে উঠল,

-না না খালাম্মা, এইটা সিড না। এমুন ছুড়ু জিনিসে বসন যায় নাকি? সিড তো গাড়িতে থাকে, আফনেগো সুফায় আছে।

আমি এত জোরে হেসে ফেললাম ওর কথা শুনে। কী বোকা বোকা কথাই না বলতে পারে ডিগবাজি। আমার হাসি শুনে মা চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাতে গিয়ে নিজেও হেসে ফেললেন। এর মধ্যে ফুলি খালা ট্রেতে করে পায়েস আর পানি নিয়ে এলেন। এরপর ডিগবাজিকে দেখে তার মুখটা কেমন সরু হয়ে গেল।

আম্মু ডিগবাজিকে বললেন,

-নাও, পায়েস খাও।

ডিগবাজি ফ্লোরে বসে যেতেই আম্মু তাড়াতাড়ি ওকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিলেন,